গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২৫ - ৩১ মার্চ ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

জনগণের টাকায়

সরকারি মিথ্যাচারের বিজ্ঞাপন

দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় (সংবাদ প্রতিদিন ১৪-২-০৫ সহ নানা পত্রিকায়) সম্প্রতি সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। করভারে ন্যুব্জ জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে প্রচার করা, রঙিন ছবিতে সাজানো এই বিজ্ঞাপনটিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য 'নতুন দিন' নিয়ে আসার আশা জাগাতে রাজ্য সরকার দাবি তুলেছে, জীবনযাপন, কাজ কিংবা বিনিয়োগের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আজ যে সবার সেরা — সে সত্য নাকি আর গোপন নেই। দাবি প্রমাণ করতে রাজ্যের অগ্রগতির কিছু তথ্য সাজিয়েছে তারা। অগ্রগতির সেইসব উজ্জ্বল চিত্র কোন্ সত্য প্রকাশ করছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনে তা কতখানি উজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে, আসুন বিচার করে দেখা যাক।

প্রথমত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "শাকসবজি, আনারস, আম, লিচু, মাছ এবং ধান উৎপাদনে ভারতের ৩০টি রাজ্যের অগ্রবর্তী এই বাংলা।" তাহলে তো রাজ্যের সাধারণ মানুষের খাদ্য সমস্যা মিটে যাওয়ার কথা, শিশু-মহিলা সহ সকলেরই পুষ্টিতে ভরপুর থাকার কথা।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪-এর রিপোর্টে রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। এটিও সরকারি রিপোর্ট, কাজেই রেখেঢেকে বলা। বাস্তব অবস্থা এই রিপোর্টের চেয়েও খারাপ। তবু এই রিপোর্ট মেনে নিলেও দেখা যাচ্ছে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের ১৬.৩ শতাংশ তীব্র অপুষ্টির শিকার। যদিও এই হার সর্বভারতীয় গড়ের থেকে সামান্য কম, কিন্তু শিশুদের রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান খুব খারাপ, ২৫টি রাজ্যের মধ্যে তার স্থান ১৯তম। রাজ্যে রক্তাল্পতায় ভোগা শিশুদের অনুপাত ৭৮ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় গড়ের থেকেও বেশি।

ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থা একইরকম উদ্বেগের কারণ। জাতীয় গড়ের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নয়টি রাজ্যের মধ্যে অষ্টম। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে লৌহ-অভাবজনিত রক্তাল্পতার সর্বভারতীয় গড় ৫২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে তা ৬৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বালিকা ও মহিলাদের জীবনভর রক্তাল্পতার হারও খুব বেশি। লক্ষ্য করার মতো বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের মধ্যেও রক্তাল্পতার হার খুব বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু শাকসবজির উৎপাদন ভারতের যেকোন রাজ্যের তুলনায় বেশি। শাকসবজির ক্ষেত্রে

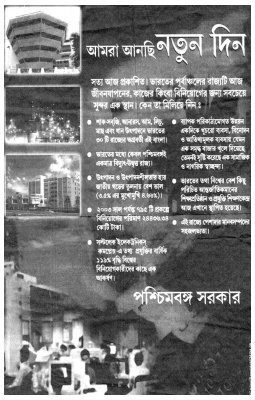

নির্ধারিত দৈনিক প্রয়োজনীয় মাত্রা ১২৫ গ্রাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মাথাপিছু শাকসবজির ব্যবহার দৈনিক মাত্র ৬৩ গ্রাম। অর্থাৎ উৎপাদনের প্রশ্নে অঙ্কের হিসেবে এ রাজ্য সেরা; কিন্তু রাজ্যের শিশু-মহিলারা এমনকী পুরুষরাও তীব্র অপুষ্টির শিকার, রক্তাল্পতার শিকার। সরকার নিজেও এই সত্য অস্বীকার করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত দুই কমিশনারের পরামর্শদাতা অনুরাধা তলোয়ার বন্ধ চা-

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- **জলঙ্গীতে অনাহারে মৃত্যু**
- **কোথায় চলেছে বাংলাদেশ**
- **মর্কিনকর্তার মুখে সিপিএম-এর প্রশংসা**
- **উন্নয়নের সুফল যাচ্ছে কোথায়**
- **জেলায় জেলায় আন্দোলন**

ইরাকে মার্কিন হানার বিরুদ্ধে

কলকাতায় দৃপ্ত মিছিল

"আজ ১৯ মার্চ, আমরা যখন কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুসর্দার জর্জ বুশের কুশপুতুল পোড়াচ্ছি, তখন খোদ আমেরিকার মাটিতেও হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধবিরোধী মিছিলে পা মিলিয়েছে। আমাদের মিছিলকে পুলিশ আটকেছে, প্রচারদপ্তর পর্যন্ত যেতে দেয়নি, নিউ ইয়র্কেও অভিজাত রাজপথ ফিফথ্ অ্যাভেন্যু দিয়ে মিছিল করার অনুমতি সেদেশের পুলিশ দেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরোধী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার আজকে, ইরাক আক্রমণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি দিবসে বিশ্বের সর্বত্র, সকলকে, যুদ্ধবিরোধী গণবিক্ষোভ সংগঠিত করার যে আহ্বান জানিয়েছে, বিশেষ করে আমাদের কাছে, অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের কাছে যে সংগ্রামী আহ্বান জানিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা আজ এই যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছি।" — মার্কিন প্রচার দপ্তরের অদূরে সহস্রাধিক যুদ্ধবিরোধী মানুষের সামনে অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ঘটক কথাগুলি বলেন। তাঁর বক্তব্যের ঠিক আগেই প্রখর রৌদ্রের চেয়েও তপ্ত স্লোগানে মুখর ছিল রাজপথ। সমবেত সহস্রাধিক মানুষ অন্যায় যুদ্ধের বিরোধী, ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী যোদ্ধা। অধ্যাপক ঘটক বলেন, "কর্পোরেট কর্তাদের চোখে যাতে না পড়ে, তাই আমেরিকার ফিফথ্ অ্যাভেন্যুতে যুদ্ধবিরোধী মিছিল করতে না দিলেও, জর্জ বুশের কারচুপির জয়ের বিজয় মিছিল চলেছে ওই ফিফথ্ অ্যাভেন্যুতেই। এ থেকেই মার্কিন গণতন্ত্রের আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে।" তিনি বলেন, "ইরাকে যাঁরা লড়ছেন, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, তাদের সাম্রাজ্যবাদীরা বলে সন্ত্রাসবাদী। আসলে তাঁরা স্বাধীনতা যোদ্ধা। গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ তাঁদের পক্ষে।"

যুদ্ধবিরোধী পথসভার সভাপতি বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব, কবি তরুণ সান্যাল বলেন, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ আজ নয়া উদারনীতির আড়ালে দুনিয়াকে নয়া ঔপনিবেশিক কায়দায় পুনরায় দখল করতে উদ্যত। বিশ্বব্যাঙ্ক এক্ষেত্রে তাদের অন্যতম হাতিয়ার। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা দুনিয়ার দেশে দেশে পুঁজি, পণ্য, পরিষেবা ও প্রযুক্তি পাঠাচ্ছে। বুশ সাহেব ইরাক যুদ্ধে তাঁর অন্যতম দক্ষিণহস্ত যুদ্ধাপরাধী উলফোইৎসকে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদে বসাচ্ছেন। তিনি বলেন, আজ যুদ্ধবিরোধী প্রধান শক্তি সোভিয়েট সমাজতন্ত্র নেই। এতে আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে। আজ আমাদের প্রত্যেককেই লড়তে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

সংক্ষিপ্ত সভার পর, এক হাতে ডলার ও অন্য হাতে ভূগোলক হাতে ধরা জর্জ বুশের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন কবি ও অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। সহস্রাধিক কণ্ঠে ধ্বনিত সোচ্চার যুদ্ধবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কালা সালিশী বিল

কংগ্রেস ও তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টায় রাজ্য সরকার

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ মার্চ, ২০০৫ এক বিবৃতিতে বলেন, "অগণতান্ত্রিক সালিশী বিলের বিরুদ্ধে গত ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্ধে যে প্রবল জনমত ব্যক্ত হয়েছে এবং যেভাবে আইনজীবীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, তাতে সরকার খানিকটা পিছু হঠে আপাতত বিধানসভায় উত্থাপন না করলেও কংগ্রেস ও তৃণমূলের সাথে বোঝাপড়া করে পুনরায় এই বিল বিধানসভায় আনবে। আমাদের দল এই কালা বিলের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবি করবে এটা বুঝে সরকার বিধানসভায় আমাদের দলকে বাদ দিয়ে আলাদাভাবে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সাথে বৈঠক করেছে।

ফলে জনগণকে সজাগ থাকতে হবে এবং সালিশী বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

১৯ মার্চ কলকাতায় অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কনভেনশন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের জলপাইগুড়ি শাখার আহ্বানে এক কনভেনশন আয়োজিত হয়। সুভাষ ভবনের নির্মল বসু মঞ্চের এই কনভেনশনে সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

রি-ডিপ্লয়মেন্টের নামে কর্ম ও কর্মী সংকোচন, অর্জিত অধিকার হরণ, চুক্তিতে নিয়োগের প্রতিবাদে এবং সমস্ত শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ, সদর হাসপাতালের চিকিৎসার মান উন্নয়ন, ভাড়া করা গাড়ি ও ভাড়া করা রোলারের পরিবর্তে সরকারি গাড়ি ও রোলার ব্যবহার করা এবং অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (পঃবঃ), ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়), পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশান (জেপিএ)-এর নেতৃবৃন্দ তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ নিজস্ব পেশাগত দাবিদাওয়া ছাড়াও স্কুল-কলেজে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি, বাসভাড়াবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, চিকিৎসার চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতার প্রয়োজনও অনুভব করেন। বিচারব্যবস্থা যেভাবে ধর্মঘট, বন্‌ধ করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে তার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের মুখপাত্ররা সোচ্চার হন।

আগামী দিনে রাজ্য সরকার সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের উপর যে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী যৌথ আন্দোলনকে আরও বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দ কলকাতা সহ জেলায় জেলায় যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের শাখা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আলিপুরদুয়ার-এ একটি শাখা গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কনভেনশনের শেষ পর্বে সাতটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে তেইশ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

বর্ধমান

আন্দোলনের চাপে হকার উচ্ছেদ স্থগিত

বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত দোকান ও বস্তি উচ্ছেদের সময়সীমা ঘোষণা করে রেল কর্তৃপক্ষ মাইক-প্রচার করে জানিয়ে দেয় ১৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে এলাকা ফাঁকা করে দিতে হবে।

এই প্রচারে হকার ও বস্তিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বর্ধমান রেলওয়ে ওভারব্রীজ এলাকায় অবস্থিত 'জনপ্রিয় হকার্স কর্নারে'র হকাররা সমবেত হয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সারা বাংলা হকার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও বর্ধমান জনপ্রিয় স্মল ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি কমরেড বিধান চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে হকাররা ১৩ মার্চ বর্ধমানের এসডিও এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে এই উচ্ছেদের প্রতিবাদে ডেপুটেশন দেন। ঐদিন বিকালে দেড়শতাধিক হকার ও বস্তিবাসী মিছিল করে বর্ধমানের ইস্টার্ন রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছেও ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধিরা বলেন — যে জমিতে হকাররা ব্যবসা করছেন তা রেলের জমি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা চলবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হকারদের এই দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন কথা দেন এবং ১৩ মার্চ হকার উচ্ছেদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানান। আন্দোলনের মাধ্যমে উচ্ছেদ আপাতত রুখে দেওয়ায় বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

১৩ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড বিধান চ্যাটার্জী বলেন, ১৯৮৬ সালে চৌধুরী বাজারে বি ডি ঘোষ রোডে জনবহুল এলাকায় 'নটরাজ সিনেমা' হল হওয়ার পর ঐ রাস্তায় হকারদের উচ্ছেদ করা হয়। তখন ইউটিইউসি-এলএস-এর নেতৃত্বে হকারদের সংগঠিত আন্দোলনের চাপে তৎকালীন জেলাশাসক জহর সরকার হকারদের পুনর্বাসনের দাবি মেনে নেন এবং রেলওয়ে ওভারব্রীজ এলাকায় বনজঙ্গল অধ্যুষিত পরিত্যক্ত জায়গায় হকারদের বসার অনুমতি দেন। হকাররা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে হকার মার্কেট তৈরি করে। এর ফলে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়, এলাকার পরিবেশও রক্ষা হয়। এখন আবার এই হকারদের উচ্ছেদ করতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই ষড়যন্ত্রকে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রুখতে হবে।

হুগলি

কোন্নগরে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

১৩ মার্চ হুগলি জেলার কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে অ্যাবেকার কোন্নগর উত্তরপাড়া শাখা কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শাখা কমিটির সভাপতি অশোক রায়। কমিটির সম্পাদক নিতাইচন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুভাষ গুহ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন, অজিত গাঙ্গুলী, মীনা বসু প্রমুখ। সম্মেলনের প্রধান বক্তা রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত দাস দাস বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও বাণিজিকীকরণ এবং বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী আগামী ২২ মার্চ বিদ্যুৎগ্রাহকদের দিল্লি অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাটে যুব বিক্ষোভ

মদের ঢালাও লাইসেন্স প্রদান, স্বনিযুক্তি ও স্বরোজগার প্রকল্পের নামে প্রতারণা এবং অনলাইন লটারির জুয়া বন্ধের দাবিতে গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এ আই ডি ওয়াই ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের যুবকরা একত্রিত হয়ে এক সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই ও'র জেলা সভানেত্রী কমরেড নন্দা সাহা ও জেলা সম্পাদক কমরেড বীরেন মহন্ত। মিছিলের পক্ষে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করে। জেলা শাসক উপস্থিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

কোচবিহার

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলন

সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতো রি-ডিপ্লয়মেন্টের নামে কর্ম ও কর্মী সংকোচনের যে রাস্তা পাকাপোক্ত করছে তার প্রতিবাদে কোচবিহার জেলার রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলন গড়ে তুলছেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড বিপুল ঘোষের নেতৃত্বে কোচবিহার গভর্নমেন্ট প্রেসের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বহু সংখ্যক কর্মচারী এই ডেপুটেশনে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

ডেপুটেশনের দাবি ছিল — অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, প্রেস আধুনিকীকরণ এবং ছাপার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও পেশাগত এবং স্থানীয় সমস্যাও ডেপুটেশনে তুলে ধরা হয়।

এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কর্তৃপক্ষ প্রেস আধুনিকীকরণ ও মনোকাস্টিং মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের আশ্বাস দেন।

বীরভূম

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আক্রমণে ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর প্রতিবাদে যুব বিক্ষোভ

বৃহৎ ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শোধ না দিলেও যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নির্বিকার, তারাই ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য গুণ্ডামি করতেও দ্বিধা করছে না। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ঋণগ্রহীতা বেকারদের তারা হাজতে পুরছে। ঋণ আদায়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের গুণ্ডামির কাজে ব্যবহার করছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যুব সংগঠন ডিওয়াইও।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের ইউবিআই ঘরুন শাখার কয়েকজন কর্মচারী বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য ৬ মার্চ ঐ ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতা জীতেন বিশ্বাসের বাড়িতে চড়াও হয়। শ্রীবিশ্বাস গৃহীত ঋণের অর্ধেক পরিশোধ করেছেন, বাকি টাকার তিনটি কিস্তি মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় আর্থিক অনটনের জন্য দিতে পারেননি। তিনি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় চান। কর্মচারীরা সময় না দিয়ে সেই দিনই কিস্তির টাকা দাবি করে এবং অশ্লীল গালাগালি করে শ্রীবিশ্বাসকে ধাক্কাধাক্কি করায় তিনি মাটিতে পড়ে যান, তাঁর মাথায় চোট লাগে। এর ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জীতেন বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ১১ মার্চ ডিওয়াইও রামপুরহাট কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে এবং ঐ ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে দোষী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, মৃত জীতেন বিশ্বাসের ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করতে হবে, মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বেকার ও ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের উপর ঋণ আদায়ের নামে জুলুমবাজি বন্ধ করতে হবে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বিডিও। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারীদের সামনে জীতেন বিশ্বাসের ঋণ মকুব করার কথা ঘোষণা করে।

বীরভূম

জেলাশাসক দপ্তরে গণবিক্ষোভ

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এর অধীনে হাসপাতালগুলির নামের তালিকা প্রকাশ, লাভপুর ও অবিনাশপুর হাসপাতালের দুর্নীতি ও দুর্নীতিপরায়ণ বিএমওএইচ-এর অপসারণ, বাসভাড়া বৃদ্ধি ও কিলোমিটারের মাপে কারচুপি রোধ, বোলপুর শহরের ভিতর বাস চলাচল ও সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ সহ ১৫ দফা দাবিতে ১০ মার্চ এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে সহস্রাধিক মানুষের স্লোগানমুখর মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক অফিসে গণবিক্ষোভে জমায়েত হয়।

এই কর্মসূচির কথা আগাম জানানো সত্ত্বেও ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য জেলাশাসকের অনুপস্থিতির কথা শোনামাত্র মিছিলকারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা অফিস চত্বরে প্রবেশ করতে চাইলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গতিরোধ করে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় মহিলা থাকা সত্ত্বেও মহিলা পুলিশের অনুপস্থিতি প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং বিক্ষোভকারীরা পুলিশ কর্ডন ভেঙে অফিস চত্বরে প্রবেশ করে। তাঁদের সামনে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। কমরেড মুখার্জীর নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। এডিএম তাঁর অধীনে কৃষিসংক্রান্ত কিছু দাবি পূরণ করার আশ্বাস দেন। সমাবেশে কমরেডস্ মদন ঘটক, কার্তিক হাজরা, বৈদ্যনাথ মাল ও মানস সিংহ বক্তব্য রাখেন। প্রশাসন ভবনের কর্মচারী ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে সমাবেশ বিশাল আকার নেয় এবং জনমানসে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

ঘন্টায় ১১ জনের আত্মহত্যা

উন্নয়নের সুফল যাচ্ছে কোথায়

সাম্প্রতিক লোকসভা অধিবেশনে বিরোধীদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উদারনীতির রথে চড়ে ভারত উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সে উন্নয়ন এমনই চোখ ধাঁধানো যে বিশ্বের মানুষ সে দিকে নজর না দিয়ে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উন্নয়নের যে চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন তা অসত্য, একথা বলার উপায় নেই। তবে তা পূর্ণ সত্য নয় — আংশিক সত্য মাত্র। অর্থাৎ দেশের মোট জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশ, মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী এবং সুবিধাভোগীরা, যারা দেশের একশ' কোটি মানুষের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে ভোগ করছে — কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যাঁদের এই উন্নয়নের মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় মেটাতে হয়, তাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটাই দিনের পর দিন কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই অনিশ্চয়তা সমাজে এত গভীর যে তার হাত থেকে রেহাই পেতে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে। শিউরে ওঠার মতো সেই চিত্র ফুটে উঠেছে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর এক তথ্যে। জানা গেছে, প্রতি ঘণ্টায় দেশের কোন না কোন স্থানে কমপক্ষে ১১ জন মানুষ আত্মহত্যা করছেন। এঁদের মধ্যে কেউ ঋণের জালে জড়িয়ে, কেউ মানসিক চাপে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন; আবার কেউ দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা এবং তার জন্য বিপুল ব্যয় বহন করতে না পেরেই নিজেই নিজের জীবন শেষ করছেন (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১২/০৩/০৫)।

তথ্যে দেখা যাচ্ছে, জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ২০০১ সালে ১,০৮,৫০৬ জন; ২০০২ সালে ১,১০,৪১৭ জন এবং ২০০৩ সালে ১,১০,৮৫১ জন। এটাও পুলিশের খাতায় রেকর্ড করা তথ্য। পুলিশের রেকর্ডের বাইরে এমন ঘটনা প্রতিদিন আরও কত ঘটছে তার হিসেব কে রাখে! কেন এই বিপুল সংখ্যক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে? পুলিশের রেকর্ডই বলছে, এই আত্মহত্যার কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক সংকট, ব্যবসায় ভরাডুবি, এবং কৃষিতে লোকসান। আত্মহত্যাকারীদের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবক-যুবতীরাও।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। আমাদের তাবড় নেতা-মন্ত্রীরাও নাকি কৃষক-অন্ত প্রাণ। অথচ ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর এক অফিসার জানাচ্ছেন, আত্মহত্যার ঘটনা, জনগণের নানা অংশের মধ্যে ঘটলেও, সংখ্যায় কৃষকরাই বেশি। অনাহার এবং ঋণের জালে জড়িয়ে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। তারপর তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, পশ্চিমবাংলা, উত্তরপ্রদেশ, এমনকী সবুজ বিপ্লবের রাজ্য বলে পরিচিত পাঞ্জাবেও।

কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির দাপট বাড়ছে, বীজ, সার, প্রভৃতির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে একচেটিয়া গোষ্ঠী। চাষীকে প্রতি বছরই নতুন নতুন বীজ উচ্চমূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। সার, কীটনাশক, সেচের জন্য বিদ্যুৎ — যা কিছু কৃষির জন্য অপরিহার্য — সবই দুর্মূল্য। কৃষির জন্য এই বিপুল ব্যয় সামলাতে কৃষকরা চড়া সুদে ঋণ করতে বাধ্য হন। অথচ কৃষি-ফসলের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা কৃষকের হাতে নেই, তা নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীরা। ফলে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পান না। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকরা শেষ- পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ করে উঠতে পারেন না। ঋণ পরিশোধ করতে সর্বস্বান্ত হয়ে কেউ কেউ কিডনিও বিক্রি করেন, তবে বেশিরভাগই বেছে নেন আত্মহত্যার পথ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবেই ওঠে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার আশি ভাগ যে কৃষক, তাদের এই অবস্থা ঘটল কেন এবং তার জন্য দায়ী কে? আজ যখন গোটা বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়নের নামে 'উন্নয়নের' সোরগোল তোলা হচ্ছে, তখন গোটা সমাজের খাদ্যের জোগান দেয় যে কৃষক, তাকে কেন খাদ্যের অভাব আত্মহত্যা করতে হবে? যে দেশের শস্যভাণ্ডারে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য মজুত রয়েছে, সে দেশের মানুষকে কেন সন্তানের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে না পারার অক্ষমতায় আত্মহত্যা করতে হবে? যে সভ্যতা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়, অথচ ক্ষুধিতের মুখে তুলে দেয় না, সে সভ্যতা আসলে কাদের সভ্যতা? প্রধানমন্ত্রী যতই একে দেশের উন্নয়ন বলে প্রচার করুন না কেন, এ যে আসলে দেশের নামে সমাজের মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর উন্নয়ন, এই কথাটাই আজ ভালভাবে বুঝতে হবে এবং এই ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাস্থ্য আন্দোলনের লক্ষ্যে কনভেনশন বাঁকুড়ায়

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে এবং জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান ও বিনাব্যয়ে চিকিৎসার দাবিতে ১৩ মার্চ বাঁকুড়া শহরের ডিওসি হলে একটি স্বাস্থ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের সভাপতি আইনজীবী তাপস চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাঁকুড়ায় একটি মাত্র মেডিকেল কলেজ, সেখানে যা অব্যবস্থা তাতে চিকিৎসা ভালো হয় না। বিপিএল সার্টিফিকেট দেখাতে পারলে হয়তো পয়সা লাগছে না, কিন্তু তা ক'জনের আছে? বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষের এই কার্ড নেই। ফলে তাদের সব ক্ষেত্রে এই চার্জ দিতে হচ্ছে। ডাঃ তন্ময় মণ্ডল বলেন, হাসপাতালে সরকারি অব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে; কিন্তু ভুক্তভোগী মানুষ তো সামনে সরকারকে পাচ্ছে না, ডাক্তার, নার্স, কর্মী যাকে সামনে পায় তাকেই দোষারোপ করে বসে। কনভেনশনের অন্যতম উদ্যোক্তা লক্ষ্মী সরকার বলেন — বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান জেলা ছাড়াও ভিন রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও রোগী আসে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড না থাকায় মেঝেতে রোগীদের থাকতে হয়। ওষুধ পাওয়া যায় না বললেই চলে, বাইরে থেকে কিনে নিতে বলা হয়। প্রয়োজনীয় স্টাফ নেই, হাসপাতালের আয়া এবং জিডি স্টাফদের সমস্যা মারাত্মক। ১ মাসের সই করে তাঁরা ১০ দিনের মজুরি পান। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে প্রধান বক্তা ডাঃ তিমির দাস বলেন — স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, হাসপাতালে টিকিটের দাম চালু করা বেসরকারীকরণের প্রথম ধাপ। ফ্রি বেড কমিয়ে পেয়িং বেড বাড়ানো হচ্ছে। সরকার বলছে টাকা নেই, অথচ বৃহৎ শিল্পপতিদের ৬৫০০০ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ১৩% সুদে হাজার হাজার কোটি টাকা লোন নিচ্ছে সরকার। পিএইচসি, স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলিকে প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে; বাঁকুড়া, এনআরএস, পিজি সব হাসপাতালেই প্রাইভেট কোম্পানিগুলি রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। স্থানীয় হেল্‌থ সেন্টারগুলিতেও তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন। এই কনভেনশন থেকে আইনজীবী তাপস চৌধুরীকে সভাপতি ও লক্ষ্মী সরকারকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১৬ জনের 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র বাঁকুড়া শাখা গঠিত হয়।

জলঙ্গীতে অনাহারে মৃত্যু

সরকারের নিষ্ঠুর উদাসীনতা

ভাঙন দুর্গত, অনাহার জর্জরিত, অনাহারে মৃত অসহায় পরিবারের মানুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পথে এগিয়েছেন। প্রকৃতির নিয়মে ভাঙন এবং তার প্রতিকারে সরকারি ঔদাসীন্য ও চরম দুর্নীতির শিকার ভাঙন দুর্গতরা ভিক্ষা ও অনাহারে মৃত্যুকেই ভবিতব্য বলে জেনেছিল। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি।

জলঙ্গীর দয়ারামপুর, পরাশপুর, টলটলিতে ভাঙন কবলিত এলাকায় বর্তমানে শুরু হয়েছে অনাহার ও অনাহারে মৃত্যু। আলিমুদ্দিন সেখ ভাঙনে সর্বস্ব খুইয়ে কাজ না পেয়ে ভিক্ষার ঝুলি অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষে ভিক্ষাও মেলেনি। ফলে, কয়েকদিন না খেতে পেয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি অনাহারে মারা গেলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী জাহেদা বেওয়া কয়েক মাস অর্ধভুক্ত ও অভুক্ত থাকার পর 'অপুষ্টিতে' মারা গেছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি একই অবস্থা সাত্তার বিশ্বাসের। দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন। পয়সার অভাবে ওষুধ জোটাতে পারেননি। ২ মার্চ তিনি মারা যান। ১২ দিনে এই গ্রামে অনাহারজনিত কারণে তিনজনের মৃত্যু হল। একইভাবে মাসখানেক আগে জুনেরা বিবি, আফিজান বেওয়া ও টলটলির গহর মণ্ডলের অনাহার, অপুষ্টি ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। অথচ জেলা প্রশাসন অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে তেমন আমল দিতে চায় না। দয়ারামপুর, পরাশপুর, টলটলিতে বেশ কয়েক বছর ধরে ভাঙন চলছে। সহস্রাধিক পরিবার ভাঙনে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অনেকের তিন, চার, পাঁচবার ভিটেমাটি ভেঙেছে। গত জুলাই মাসে মাত্র দশ দিনেই ৩৫০টি পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। গত আট মাসে শত শত মানুষ পথের ধারে, বাগানে, জঙ্গলে ঠাঁই নেয়। আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য কাজ, খাদ্য, আশ্রয় দিয়ে সরকার একটু মানবিকতার পরিচয়ও দেয়নি। সরকারের দায়িত্বহীনতার কারণে প্রায় একশোর বেশি মানুষ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরছে। দুঃখের বিষয় এত ভিখারিকে ওই এলাকায় ভিক্ষা দেবারও তেমন লোক নেই। অসহায় মানুষদের হাতে কাজ নেই, আবাদের জমি নেই, খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি প্রায় দুশো ভাঙন দুর্গত অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে নিয়ে জেলাশাসক দপ্তরে যায়, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে দুর্গত মানুষদের কাজ, খাদ্য ও পুনর্বাসনের দাবি তোলে। পরাশপুরের চাহাতন বিবি সহ আরও অনেকে জেলাশাসকের কাছে তাঁদের দুরবস্থার কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রত্যেকে কাজ পাবে, পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা বাস্তবে লক্ষ্য করা গেল না।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি 'মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃবৃন্দ দয়ারামপুর, টলটলি, পরাশপুরের অসহায় দুর্গত মানুষদের কাছে যান। জেলা সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, জেলা অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু, স্থানীয় নেত্রী আছিয়া বেগম সহ আরও অনেকে ভাঙন দুর্গত মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শতাধিক ভাঙন দুর্গত মানুষ তাদের মর্মান্তিক অবস্থা নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন। বৃদ্ধা ফতেজান বেওয়া অভিযোগ করে বলেন — আগেকার অনেক ধনী পরিবার এখন খেতমজুর হয়েছে। অনেকে ভিক্ষা করে। আমারও সব ছিল। এখন ভিক্ষা করি। ভিক্ষাও সব দিন পাই না। সরকার একটু সাহায্য করে না। কী করে বাঁচব? গ্রামের যুবক বাবলু মণ্ডল জানালেন, সাতদিন আগে পঞ্চায়েতে মাটি কাটার দু'দিন কাজ করেছি। এখন পাচ্ছি না। বাড়িতে রোজ রান্না হচ্ছে না। গ্রামে অন্য কোন কাজ নেই। কয়েকজন বাধ্য হয়ে কাজ করতে বোম্বে গেল। আমি বুড়ো বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে রেখে যেতে পারছি না। চলে গেলে তারা কী খাবে? বৃদ্ধা আমিরুণ বেওয়া জানান, আজ একটু কপি পেয়েছিলাম তাই সেদ্ধ করে খেয়েছি। বৃদ্ধ নিমাই মণ্ডল কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অভিযোগ করেন, আমার ১৬ বিঘা জমি ছিল, এখন ভিক্ষে করি। কেউ কাজে নেয় না। বিপিএল কার্ড নাই। রোজ খেতে পাই না। বয়স্ক ভাতা পেলে বাঁচতাম। আলিমুদ্দিনের মতো আমারও দুর্দশা হবে। বৃদ্ধা ভানু বেওয়া খুব অসুস্থ, ভিক্ষা করার ক্ষমতা নাই। কেঁদে জানালেন, খাবার নাই, একটু ওষুধ নাই, সরকার একটু সাহায্য করে না।' মানুষের এই দুরবস্থার মধ্যে সাবদুল মণ্ডল সহ আরও অনেকে তাঁদের আরও দুশ্চিন্তার কথা জানান। খোকা বিশ্বাস, সমর সরকার এরকম কয়েকজন কিছুদিনের জন্য তাঁদের অব্যবহৃত জায়গাটিতে থাকতে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলছেন, এক্ষুনি উঠে যেতে হবে। আমরা কোথায় যাব? সকলের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও একরাশ হতাশা। লুকমান মণ্ডল, হজরত মোল্লা, তরণী সরকার, রহমান বিশ্বাস অভিযোগ করেন — শুনেছি জেলাশাসক নাকি বলেছেন, পঞ্চায়েতে মাটি কাটার কাজ সবাই পাবে। কিন্তু সিপিএমের পঞ্চায়েত আমাদের মাটি কাটার কাজ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। চরে গরুর বদলে নিজেই লাঙল টানার কাজ ক'দিন করেছি, এখন তাও নাই। পঁচিশ বছরের গৃহবধূ শ্যামলী মণ্ডল শতচ্ছিন্ন পোষাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে জানালেন, হরেন মণ্ডলের জমিতে আমরা আছি। এক্ষুনি উঠে যেতে বলছে। কোথায় যাব? আমার শ্বশুরের ১৬ বিঘা জমি ছিল, চার বার বাড়ি ভেঙেছে। আমার স্বামী উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু তারও কোথাও কাজ নাই, মাঝে মাঝে মাছ ধরে, বিএসএফ-এর অত্যাচারে এখন তাও বন্ধ। যুবতী অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিএসএফ পাচার করে দেয়। তাই রাত্রে বেরোতে ভয় পাই। আমাদের পাড়ার বিশাখা মণ্ডল, সাত বছর বয়স, ক'দিন ধরে না খেতে পেয়ে মাটি খেয়ে মারা গেল। আমাদের কী হবে?

টলটলি গ্রামে একই অবস্থা। অনাহারে মৃত গহর মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী আজেদা বেওয়ার মাত্র ২২ বছর বয়স। ছোট দুটি বাচ্চা নিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। তার শাশুড়ি জঙ্গল থেকে মানকচু তুলে এনে জানালেন, আজ এটি সেদ্ধ করে খাব। আর কোন খাবার নেই। সামসের মণ্ডলের জমি ছিল ৬০ বিঘা। এখন অন্যের জমিতে মুনিষ খাটে। মাঝেমধ্যে ভিক্ষা করে। ছহিরুদ্দিন মণ্ডল, খেলাফৎ

সাতের পাতায় দেখুন

আবারও গ্রেনেড! আবারও রক্তস্রোত! কোথায় চলেছে বাংলাদেশ?

(বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্র ভ্যানগার্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত)

(গত সংখ্যার পর)

দেশে যে কোন বোমা বা গ্রেনেড হামলা হলে প্রথমেই সন্দেহের তীর যায় মৌলবাদী শক্তিগুলোর দিকে। অথচ আজ পর্যন্ত কোন সরকারই যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এ বিষয়টা স্পষ্ট করল না। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উদীচী, রমনা, সিপিবিসহ ৬টি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি ঘটেছে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগেরই কার্যালয়ে, যার ফলে দলটির অন্তত ২১ জন নেতা-কর্মী নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছে। ওই সময়ে গোপালগঞ্জে খোদ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় সরকারি ভাষ্যমতে ৭৫ কেজি ওজনের বোমা পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিটি ঘটনার জন্য তৎকালীন সরকার মৌলবাদী শক্তিকে দায়ী করেছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তার অনুরাগীরা এখনও ওই একই কথা বলছেন। কিন্তু বিস্ময়কর হল, ক্ষমতায় থাকাকালে যথেষ্ট সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও তারা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে যাননি।

আবার, বিএনপি ক্ষমতায় আছে মৌলবাদী শক্তিকে সাথে নিয়ে। তারা মুখে বলছে, বোমা সন্ত্রাসের জন্য মৌলবাদীরা দায়ী নয়, কিন্তু তদন্তের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করছে না। বিগত নির্বাচনী ইস্তেহারে তাদের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল ক্ষমতা পেলে এ বিষয়ে তারা কার্যকর উদ্যোগ নেবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা নেওয়া হয়নি। ফলে, মনে হচ্ছে, বোমা সন্ত্রাসীদের খুঁজতে গিয়ে আমরা এক গোলক ধাঁধাঁয় পড়েছি।

বিদ্যমান বিশ্ব বাস্তবতা এবং আমাদের শাসকশ্রেণীর অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রসার ঘটছে, এটা এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার। তথাকথিত বাংলা ভাই বাহিনী, আল হিকমা প্রভৃতি জঙ্গি গ্রুপের তৎপরতা উত্তরাঞ্চলসহ কিছু কিছু এলাকায় তো খুবই উদ্বেগজনক। এদের কিছু কিছু সদস্য ইতোমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়া ওদের স্বীকারোক্তিও পত্রিকায় এসেছে। সেসবের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় সম্প্রতি বগুড়ায় নাট্যানুষ্ঠানে ও নাটোরের যাত্রামঞ্চে বোমা হামলার মত বেশ কয়েকটি ঘটনার সাথে ওরা যুক্ত। কিন্তু ২১ আগস্টের মত প্রলয়ংকরী গ্রেনেড হামলা সংঘটিত করার শক্তি-সামর্থ্য কি ওদের আছে?

এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। ফলে ২১ আগস্ট বা হবিগঞ্জ গ্রেনেড হামলার মত ঘটনাগুলোর কারণ উদঘাটনে একটু ভিন্নভাবে ভাবতে হচ্ছে।

শেখ হাসিনা মনে করেন, ২১ আগস্টের জন্য সেনাবাহিনীর একাংশ দায়ী আর সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় বহুবার ছাপা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজও তা-ই মনে করেন। তার এ সংক্রান্ত বিবৃতি নিয়ে পত্রিকায় তখন অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল।

এখানে আমরা ২১ আগস্ট প্রসঙ্গে শেখ হাসিনাকে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী যা বলেছিলেন তা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, ২১ আগস্ট কারা গ্রেনেড হামলা করেছে তা আপনি (শেখ হাসিনা) যেমন জানেন তেমনি আমিও জানি। শেখ হাসিনার তরফ থেকে এর কোন প্রতিবাদ আমরা পত্রপত্রিকায় দেখিনি। সাকা চৌধুরীর বক্তব্যে কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল?

২১ আগস্টের ঘটনায় কোন বিদেশী শক্তির জড়িত থাকার বিষয়টা অনেকেই বিশ্বাস করেন। বলা যায়, এ ধারণার সপক্ষে জনমত বেশ প্রবল। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত কলাম ও নিবন্ধগুলো লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। সেখানে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা খুবই ভেবে দেখার মত।

বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্বের কথাও আমরা বলেছি। তাছাড়া আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারও কারও কারও কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এখানকার ক্ষমতায় যে-ই আসুক তাকে কখনও সুবিধা দিয়ে, কখনও চাপে ফেলে নিজেদের বাগে রাখাটা ওই দেশগুলোর শাসকদের কাছে একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোও তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই সংগ্রামশীলতা এবং যূথবদ্ধতা এদেশের জনগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বহু অবক্ষয় সত্ত্বেও যেকোন প্রাকৃতিক-সামাজিক দুর্যোগে এখনও তা নজর কাড়ে। সেই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম থেকে সর্বশেষ '৯০ পর্যন্ত শত-সহস্র রাজনৈতিক আন্দোলনে তার বিশিষ্ট রূপ দেখা গেছে। এখন এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে সত্যিকারের একটা বিপ্লবী চেতনা যুক্ত হলে আজকে দেশী-বিদেশী লুটেরাদের যে সীমাহীন শোষণ-লুটপাট চলছে তা অব্যাহত রাখাটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তাকে ধ্বংস করার জন্য নানামুখী চক্রান্ত চলছে। তার মধ্যে অন্যতম হল নানা ধরনের সন্ত্রাস ছড়িয়ে জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা, আরেক দিকে সন্ত্রাস দমনের নামে জনগণের হরেক রকমের কালাকানুনের শেকলে বাঁধা। সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, বোমা বা গ্রেনেড সন্ত্রাস ওই পরিস্থিতি তৈরিরই অন্যতম হাতিয়ার। যে কারণে আমরা দেখছি, বোমা হামলার পর অপরাধীদের না ধরে ভবিষ্যৎ বোমাবাজি ঠেকানোর নামে ও সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাস দমনের কথা বলে দেশকে একটা পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম সহ বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৫৪ ধারা, ৫০৫(ক) ধারা, দ্রুত বিচার আইনের বিধান সংযোজন, বিভিন্ন মেট্রোপলিটন আইনে লিপিবদ্ধ (ডিএমডি অ্যাক্ট ৮৬ এর মত) কালো বিধানসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলো কাজে লাগিয়ে সরকার গণগ্রেফতার, মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করা সহ নানাবিধ নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছে। তাছাড়া, র‍্যাব, চিতা, কোবরার মত বিভিন্ন বাহিনী ক্রসফায়ারের নামে যেভাবে বিনাবিচারে মানুষ হত্যা করে চলেছে তা খুবই আতঙ্কজনক।

শুধু তাই নয়, সম্প্রতি সরকার সন্ত্রাসী হামলা ঠেকানোর নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশের ওপর মাঝেমাঝেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। ইতোমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যাত্রা, মেলা, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বাংলা একাডেমীর বই মেলায় এ বছর মানুষের যাতায়াত র‍্যাব-পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেরও একই অবস্থা করা হয়েছে। এসব কি একটা ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের আয়োজনের পরিপূরক নয়? যদি তাই হয় তাহলে কি বলা যায় না বোমা বা গ্রেনেড সন্ত্রাসের সুরাহা করতে আমাদের শাসকদের উদ্যোগহীনতার পেছনে এটাও একটা অন্যতম কারণ হতে পারে?

বিশেষজ্ঞদের মতে ২১ আগস্ট এবং হবিগঞ্জের ঘটনায় একই ধরনের গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়েছে। হামলার ধরন এবং লক্ষ্য দেখে তারা বলছেন, উভয় ঘটনায় সম্ভবতঃ একই চক্র জড়িত। যদি তা-ই হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে এ ঘটনারও কোন সুরাহা হবে না। কারণ ঘটনার সম্ভাব্য হোতা হিসেবে যে সব শক্তির কথা বলা হল তাদের স্বরূপ উন্মোচন করার শক্তি-সাহস আমাদের শাসকশ্রেণী ধারণ করে না।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী

অব্যাহত বোমা-গ্রেনেড হামলা এবং সেসবের প্রতিকারহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা দিন দিন খুব ঘনীভূত হচ্ছে যে, আমরা এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেশজুড়ে যেন এক ঘোর অমানিশা নেমে আসছে। এর পাশাপাশি জনগণের বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে একটা অসহায় আর্তিও ভেসে আসছে যে, এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী?

এ ব্যাপারে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আচরণ জনআকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, এটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহকর্মীদের বক্তৃতা শুনলে মনে হয় দেশে জনগণের উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কোন ঘটনাই ঘটেনি। সন্ত্রাসী ঘটনা যা ঘটেছে তা নস্যিমাত্র। অর্থমন্ত্রীর কথা তো ঘোরতর জনবিরোধী। তিনি একেবারে ভাবলেশহীনভাবে একটা কথা অহরহই বলে থাকেন, ছোট একটা জায়গায় ১৪ কোটি মানুষ আছে, তারা যে একে অপরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে না এটাই তো বিস্ময়কর। এজন্য নাকি জনগণের শোকর করা (কৃতজ্ঞ থাকা) উচিত। কতটা অসংবেদনশীল হলে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এমন নির্মম কথা বলতে পারেন? প্রায় একই ধরনের কথা সরকারের অন্য মন্ত্রীদেরও মুখ থেকে শোনা যায়। কিছু দিন আগে উত্তরাঞ্চলে বাংলা ভাই রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র কায়েম করেছিল। তখন ওই বাহিনী লোকজনকে বাড়ি থেকে ধরে এনে শরীয়তি কায়দায় বিচারের নামে পিটিয়ে মেরে ফেলে তা প্রদর্শনের জন্য উল্টো করে গাছে লটকিয়ে রেখেছিল। একে একে ২২ জন মানুষকে তারা হত্যা করেছিল। শতাধিক মানুষের হাত-পা ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীরা অনবরত বলে গেছেন, বাংলা ভাই বলে কিছু নেই। সবই বিরোধী দল ও পত্রপত্রিকার প্রচারণা। বোমা-হামলাগুলো নিয়েও তারা কয়েকদিন আহা-উহু করে তারপর গদাইলস্করি চালে চলছে। এভাবে কতদিন চলবে? আর কতটা বোমা বা গ্রেনেড হামলা হলে তাদের হুঁশ হবে? তারা কি দেশের পরিস্থিতিকে মানুষ যেন তাদের ভাষায় পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খায় সেদিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?

এদিকে শাসকশ্রেণীর অপর অংশ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দেরও এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। তারা সরকারে থাকাকালে বোমা হামলাগুলোর রহস্য উদঘাটনে বর্তমান সরকারের মতই উদাসীন থেকেছে, তা আমরা আগেই বলেছি। সাম্প্রতিক সময়ে যতগুলো বোমা বা গ্রেনেড হামলা হয়েছে তার অধিকাংশেরই শিকার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তারপরও দলটি কার্যকর কোন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

২১ আগস্টের ঘটনার পর গোটা দেশের জনগণ প্রত্যাশা করেছিল, এত বড় ঘটনা সরকারের পক্ষে হজম করা সম্ভব হবে না। গণআন্দোলনের চাপে সরকার তার সুরাহা করতে বাধ্য হবে। কিন্তু দেখা গেল, সুনামি সদৃশ ওই ঘটনাও সরকার চাপা দিতে সক্ষম হল। আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্র দলগুলো সরকার পতনের দাবিতে একটার পর একটা কর্মসূচি নিল বটে, কিন্তু গণসম্পৃক্তি না থাকায় তার বর্ষাফলক ভোঁতা প্রমাণিত হল। সেই সাথে ২১ আগস্টের তদন্তের দাবিও ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল। আর আওয়ামী লীগের নেতারাও কি তদন্তের ব্যাপারে সরকারকে নিরন্তর চাপে রাখতে উদ্যোগী ছিলেন? কর্মসূচির ধরন এবং ওই সময়ে দেওয়া শেখ হাসিনা ও তার সহকর্মীদের বক্তব্য সমূহ পরখ করলে এ সংশয় যে কারও মাঝে সৃষ্টি হবে। সম্ভবত কিবরিয়া সাহেবের মাঝেও এ সংশয় ছিল। তাই তিনি তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক মৃদুভাষণের নির্বাহী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকারকে বলেছিলেন, "... দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে কেন যেন উৎসাহ বোধ করতে পারছি না। আওয়ামী লীগ ঠিক কী করতে চাইছে সেটা বুঝতে পারছি বলে মনে হয় না। কর্মীরা রাস্তায় নামলেই পিটুনি খাচ্ছে, জেল-জুলুমের শিকার হচ্ছে। উগ্রবাদীরা হত্যা করছে বেছে বেছে জনপ্রিয় নেতাদের। কীভাবে এই ফ্যাসিবাদী সরকারকে মোকাবেলা করা হবে বুঝে উঠতে পারছি না।" (প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি '০৫, বিভুরঞ্জন সরকারের কলাম)

২১ আগস্টের রেশ না কাটতেই ২৪ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হলেন অধ্যাপক ইউনুস। তিনি মৃত্যুকালেও বঙ্গবন্ধু পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ভাষায় তিনি ছিলেন আগাগোড়া নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগ কর্মী। তাঁর খুনীদের গ্রেফতারের দাবিতেও আওয়ামী লীগ জোরদার কোন কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে তিনি খুন হয়েছেন মৌলবাদী শক্তির হাতে। আওয়ামী লীগ নেতারাও ইদানীং হরহামেশাই মৌলবাদী শক্তি নির্মূলের শ্লোগান দেন। কিন্তু মৌলবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোন আদর্শিক সংগ্রাম আছে কি?

হবিগঞ্জে গ্রেনেড হামলার পরপর শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, সরকারকে আর ছাড় দেওয়া হবে না। এখন থেকে লাগাতার কর্মসূচি চলবে। সে-হিসেবে তাদের কর্মসূচি চলছেও। কিন্তু যে-ধারায় তা চলছে তাতে কি সরকারকে ওই ঘটনার সুরাহা করতে বাধ্য করা যাবে? ঘটনাপ্রবাহ দেখে সে ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, আবারও দু'দলের পাল্টাপাল্টিতে পড়ে আসল বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি অব্যাহতভাবে বলে যাচ্ছে, শেখ হাসিনা ওই ঘটনারই হোতা। উল্টোদিকে আওয়ামী লীগও সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছেলের ঘাড়ে এর দায় চাপাচ্ছে। দু'পক্ষের এই কথার তোড়ে তদন্ত কতটুকু এগোল সে-খোঁজ ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে দেশে একটা সত্যিকারের সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান বিএনপি-আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীক দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টির অসুস্থ রাজনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে তা সম্ভব নয়। ১১ দল যদি প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষিত তার অঙ্গীকারের ওপর দাঁড়িয়ে বোমা ও গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের গ্রেফতার, বিচার এবং জনজীবনের জরুরী সমস্যাগুলো নিরসনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে যেত তাহলে দেশে অবশ্যই সত্যিকারের একটা গণআন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হত। দ্বি-দলীয় বৃত্ত ভাঙ্গার পথও প্রশস্ত হত। কিন্তু ১১ দলের কতিপয় শরীকের আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা এবং যে কোন উপায়ে ক্ষমতার বলয়ে ঢোকার মোহ সে সম্ভাবনাকে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ অবস্থায় অপরাপর বাম-প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উচিত বসে না থেকে নিজেদের মধ্যে সর্বনিম্ন সমঝোতা ও সর্বোচ্চ কর্মসূচির ভিত্তিতে সকল বোমা ও গ্রেনেড হামলার যথাযথ তদন্ত-বিচার এবং জোট সরকারের দুঃশাসন প্রতিরোধের লক্ষ্যে গণজাগরণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো। (বানান ও ভাষা অবিকৃত রাখা হয়েছে)

জনগণের টাকায় সরকারি মিথ্যাচারের বিজ্ঞাপন

একের পাতার পর

বাগানগুলিতে ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়ে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আদালতে এবং রাজ্য সরকারের কাছে পেশও করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোল সহ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদে ভাঙনদুর্গত মানুষ অনাহারে মরছে, বন্ধ কারখানার শ্রমিক অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করছে। চাষী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে নিরুপায় হয়ে কোথাও নিজে, আবার কোথাও সপরিবারে আত্মহত্যা করছে। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই এইসব সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। চলতি বছরের গোড়ার দিকে মুখ্যসচিবের নির্দেশে রাজ্যের ১৯টি জেলার জেলাশাসক ও ৩৪১টি ব্লকের বিডিও-রা মিলে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁদের সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, রাজ্যে ৪৬০৪টি গ্রামে বছরে দু-তিন মাস অনাহারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তার আগের আরও কিছু মাস নিশ্চয়ই অর্ধাহারের পরিস্থিতি চলে। তাহলে রাজ্যের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদনের হিসাব ও তার বিজ্ঞাপন অর্ধাহার-অনাহার-অপুষ্টি-রক্তাল্পতায় ভুগতে থাকা জনসাধারণের কোন কাজে লাগে?

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ''ভারতের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্য।'' তাই যদি হয় তবে রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি কেন? অসংখ্য গ্রামে তো আজও বিদ্যুৎ সংযোগ যায়নি; তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ ঘাটতি কি 'বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের' লক্ষণ?

আসলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর ঘাটতিশূন্য বাজেটের মতো এই দাবিটিও অন্তঃসারশূন্য; গরম পড়তে না পড়তে লোডশেডিংয়ের দাপটে অতিষ্ঠ মানুষকে সে কথা তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবার দরকার হয় না। তাছাড়া, এ দাবি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম পশ্চিমবঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশি কেন? রাজ্যের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক, ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের ওপর সরকার ক্রমাগত বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের বোঝা চাপিয়ে চলেছে কেন?

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ''উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার হার (এরাজ্যে) জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ ভাল।'' অর্থাৎ তৈরি হওয়া মোট দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং শ্রমিক পিছু উৎপাদনের পরিমাণ —দুই-ই রাজ্যে সারা দেশের তুলনায় বেশি। এবার দেখা যাক, উৎপাদনের এই প্রাচুর্য, এরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে কতটা স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছে।

যোজনা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের হার ৩১.৮৫ শতাংশ। মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তফশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুরা একত্রে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এবং গ্রামবাংলায় এই তিন অংশের মানুষই সবচেয়ে গরিব। সরকারের এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, দেশে যে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে (সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও অন্যদের মতোই যার ঢাক পিটিয়ে চলেছে), তার দ্বারা অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার কোন নাটকীয় উন্নতি তো ঘটেইনি, বরং সাধারণভাবে তা মানুষের জীবনে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে আঞ্চলিক বৈষম্যেরও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি ঘটেছে।

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪ থেকে আরো জানা যাচ্ছে, যেখানে ১৯৯০ সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৪৭৬ গ্রাম, সেখানে ২০০১ সালে তা কমে হয়েছে ৪১৮ গ্রাম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যেও স্পষ্ট যে, ১৯৮৭ - '৮৮ সালে মাথাপিছু মোট ক্যালরি ভোগের পরিমাণ দৈনিক ২২০০ ক্যালরির সামান্য বেশি থাকলেও ১৯৯৯-২০০০ সালে তা নেমে এসেছে ২১৫০ ক্যালরিতে। ইতিমধ্যে সরকার মূলধনী খাতে ব্যয় কমিয়েছে। যার ফলে নানা প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ কমেছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে অধোগতি ঘটেছে। সাধারণ মানুষের সামনে খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ হ্রাস এবং সরকারি পরিষেবার প্রসারের ক্ষেত্রে অবনমন ও মানের অবনতির সামগ্রিক পরিণতিতে বিশেষ করে মহিলাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, উৎপাদনের যত বৃদ্ধিই ঘটুক এবং মাথাপিছু উৎপাদনে শ্রমিকরা যত অগ্রগতিই ঘটাক — এর সমস্ত সুফলই থেকে যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নাগালের বাইরে। গরিব নিঃসহায় মানুষ তথাকথিত 'বামফ্রন্ট'-শাসিত এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করেও জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

চতুর্থত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, (১) ২০০৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ৭৯৫টি প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৪,৪৩৬.৩৪ কোটি টাকা, এবং (২) সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স-এ তথ্য প্রযুক্তির বার্ষিক ১১৯ শতাংশ বৃদ্ধি বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে এক আকর্ষণ।

এবার দেখা যাক, এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থানের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে। কেননা, যতই বিনিয়োগ ও শিল্পস্থাপন হোক না কেন, তাতে যদি উপযুক্ত সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয়, তবে তার তেমন কোন উপযোগিতা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না। রাজ্যের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪-এ স্বীকার করা হয়েছে, ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে পুরুষদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যাপক অধোগতি দেখা গেছে, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কার্যত ঋণাত্মক হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বদ্ধদশা দেখা গেছে। এমনকী এই পর্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সংখ্যাও কমেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হারে রাজ্যের পরিস্থিতি বাস্তবিকই সর্বভারতীয় গড়ের থেকেও খারাপ।

বলা হয়েছে, শহরাঞ্চলে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে বেশি মাত্রায়। প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট বেতন, পিএফ বা অন্যান্য প্রাপ্য শ্রমিকের পাওয়ার কথা। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন কার্যত কিছু নেই, কর্মদিবসও ৮ ঘণ্টার চেয়ে বেশি। দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০ সালে যেখানে মোট কর্মীদের ১২ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন সেখানে ২০০০ সালে তা নেমে এসেছে ৮.৭ শতাংশে। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ০.৬ শতাংশেরও নিচে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এটাই সবচেয়ে কম।

ন্যাশনাল লেবার সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে কাজ পেয়েছেন ২৫ হাজার ১৪৯ জন এবং কাজ হারিয়েছেন ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৮৬ জন। অর্থাৎ যা কর্মসংস্থান হয়েছে, তার ৪০ গুণ মানুষ কাজ হারিয়েছে। তাহলে এই বিনিয়োগ এবং ইনফোটেক শিল্পের 'বিকাশে' সাধারণ মানুষের সুবিধা কী? তাতে বিনিয়োগকারী পুঁজিমালিকদের মুনাফার ভাণ্ডার স্ফীত হয় ঠিকই, কিন্তু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন মানুষের জীবনে এতটুকু পরিবর্তন হয় কি?

পঞ্চমত, বিজ্ঞাপনে বেশ বড়াই করে বলা হয়েছে ঃ ''ভারতের তথা বিশ্বের বেশ কিছু পরিচিত আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি শিক্ষণকেন্দ্র আজ এখানে স্থাপিত হয়েছে।''

হ্যাঁ, একথা ঠিকই যে, রাজধানী শহর কলকাতায় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু আধুনিক উপকরণে সজ্জিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি শিক্ষণকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকারের কৃতিত্ব কোথায়? সেগুলি বেসরকারি পুঁজির মালিকরা তৈরি করেছে শিক্ষা বেচে মুনাফা করতে। সেগুলিতে পড়তে গেলে যে বিপুল আর্থিক সামর্থ্য দরকার — তা কেবল একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও মূলত উচ্চবিত্তদের পক্ষেই যোগান দেওয়া সম্ভব। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। তাহলে এদের জন্য কী ব্যবস্থা? এদের জন্য আছে শতজীর্ণ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা, সেখানেও নানান ফি-বৃদ্ধি ঘটিয়ে এদের সামনে শিক্ষার দরজা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ বলছে — আঞ্চলিক বৈষম্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে সাক্ষরতা ও শিক্ষায়, এবং যে অঞ্চল যত কম উন্নত ও যত দুর্গম, সেখানে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ তত কম।

শিক্ষার সার্বিক হাল যে কতটা খারাপ তার চিত্রও এই রিপোর্টে স্পষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে বলা হয়েছে, মৌলিক পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব আজও পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ বিকাশের পথে গুরুতর বাধা হিসাবে রয়ে গেছে। শুধু যে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় নেই, তা নয়। বিদ্যালয় থাকলেও তার যথাযথ বাড়ি নেই। রাজ্যের মোট বিদ্যালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশেরই ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। এক কামরা বিদ্যালয়ের সংখ্যাও মোট বিদ্যালয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের সরঞ্জাম ও পরিষেবার বিরাট ঘাটতি আছে। গ্রামের বহু স্কুলবাড়িতে দিনের আলো ঠিকমতো ঢোকে না। আবার বিদ্যুৎও নেই। এছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত শৌচাগার (বিশেষত মেয়েদের জন্য) নেই, টেবিল চেয়ার বেঞ্চ আলমারি খুবই কম। এমন প্রাণহীন অবস্থার জন্য শিশুদের কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় একটি জায়গাই হয়ে উঠতে পারে না বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, পঞ্চমশ্রেণীতে যাওয়ার আগে স্কুলছুট (ড্রপআউট) হয় ৭৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিকে যাওয়ার আগে স্কুলছুট হয় ৭৮.৭৪ শতাংশ। প্রাইমারিতে ৪০ হাজার শিক্ষকপদ শূন্য, মাধ্যমিক স্কুলে শূন্যপদ ৩০ হাজার। রাজ্যের ১৯০০ প্রাইমারি স্কুল উঠেই গেছে।

যে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক শিক্ষা গড়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রাথমিক শিক্ষার করুণ হাল সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশিত এবং সরকারের তা অজানা নয়। তা সত্ত্বেও রাজ্যের অগণিত মানুষকে এইভাবে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর দুলালের জন্য গুটিকয়েক আন্তর্জাতিক মানের ব্যয়বহুল শিক্ষাকেন্দ্র (তাও প্রায় সবই বেসরকারি) তৈরি করে এবং খবরের কাগজে তারই পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা সাফল্যের জয়ঢাক পেটাচ্ছে। এর নাম কি সততা? এরই নাম কি গরিব মেহনতি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা?

ষষ্ঠত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ''এই রাজ্যে পেশাদার মানবসম্পদের সহজলভ্যতা।''

বিজ্ঞাপনের এই অংশটুকুতে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে ফেলেছে রাজ্য সরকার। সত্যই এ রাজ্যে মানবসম্পদের ছড়াছড়ি। বুদ্ধদেববাবুরা এ রাজ্যের মানবসম্পদের সহজলভ্যতার নামে সস্তা শ্রমের টোপ ফেলে দেশি-বিদেশি পুঁজিমালিকদের লোভ দেখিয়ে বলছেন — নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে এই নিরুপায় বেকারবাহিনীর শেষ রক্তবিন্দুটুকু শুষে নিয়ে মুনাফার থলি ভরাবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ ! তার বেশি আর কী? রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত বিপুল বেকারবাহিনীর কাছে এই 'পেশাদার মানবসম্পদের সহজলভ্যতা'র সরকারি বিজ্ঞাপন কোন্ কাজে লাগবে? মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪-এর রিপোর্টেই দেখানো হয়েছে যে, দেশের বেশিরভাগ রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা তীব্রতর। এই পরিস্থিতিতে, রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে শ্রমশক্তির ৫৬ থেকে ৬২ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। রিপোর্ট বলছে, এ রাজ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরির হার সর্বভারতীয় গড়েরও নিচে। ১৯৯৯-২০০০ সালে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত সংস্থা মিলে যে গড় মজুরি দিয়েছে তা সর্বভারতীয় গড়ের থেকে শুধু যে কম তাই নয়, ন্যূনতম মজুরি আইনে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকেও কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে যে সমস্ত 'পার্ট-টাইম' শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে তাদের বেতনও যথেষ্ট কম।

সপ্তমত, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ''ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একদিকে খুচরো ব্যবসা, বিনোদন ও আতিথ্যমূলক ব্যবসায় যেমন এক সমৃদ্ধ বাজার খুলে দিয়েছে, তেমনই সৃষ্টি করেছে সামাজিক ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য।''

বিজ্ঞাপনের চটকদার ভাষা ব্যবহার করে এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার 'পরিকাঠামোগত উন্নয়ন', 'বিনোদন ও আতিথ্যমূলক ব্যবসা' ইত্যাদির উল্লেখ করে মূলত কলকাতা শহরে ইদানীংকালে গড়ে ওঠা ফ্লাই-ওভার, দামি হোটেল-রেস্তোরাঁ-বার-নাইটক্লাব সহ শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল, বিলাসবহুল আবাসন ইত্যাদিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তারা বলেছে, এই নির্মাণ একদিকে যেমন নতুন বাজার সৃষ্টি করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে সামাজিক ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন সৃষ্টি হওয়া এই বাজারের ক্রেতা কারা? ফসলের দাম না পাওয়া চাষী, ছাঁটাই শ্রমিক, কর্মহীন বেকার এবং কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় ভারাক্রান্ত জনসাধারণের আশি শতাংশ মানুষের জন্য নিশ্চয়ই এইসব শপিং মল, নাইটক্লাব, গাড়ি পার্ক করবার পার্কোম্যাট তৈরি হয়নি! এসবের খরিদ্দার হল মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত মানুষ। এদেরই জন্য বাস্তুচ্যুত জীবিকাচ্যুত হতে হয়েছে হাজার হাজার হকার, দোকানদার, গরিব চাষী ও খেতমজুরদের।

বিজ্ঞাপনে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার নতুন দিন আনার আশা প্রকাশ করেছে, সত্য প্রকাশ করার দাবি তুলেছে। এগুলি আসলে, রঙিন বিজ্ঞাপনের ঝলমলে চেহারার আড়ালে রাজ্যের নিঃসহায় গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের বোবা কান্নার তীব্রতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা, তার বেশি কিছু নয়।

ছত্তিশগড়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, নেতাজী সুভাষ প্রাইমারি স্কুল এবং ভিলাই জেসিস-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৬ মার্চ দুর্গের কৈলাশ নগরে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ৫০০ রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং তাদের বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয়। ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ অজয় গুপ্তা, ডাঃ দিব্যা শ্রীবাস্তব, ডাঃ বৃন্দা মোডগে, ডাঃ অখিলেশ্বর সিংহ, ডাঃ রবীন্দ্র পাটিল, ডাঃ নিবাস অধিকারী, সঞ্জীব সিংহ, কমলা মণ্ডল প্রমুখ চিকিৎসা পরিচালনা করেন। ওষুধের ব্যবস্থা করেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও ডাঃ বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত

বীরভূম

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে সিউড়ী সাহিত্য পরিষদ হলে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের উপস্থিতিতে আলোচনা, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।

সভা উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড ইরা বোস। সভায় উপস্থিত দুই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সাবিত্রী ভট্টাচার্য ও বীথি গুপ্ত তাঁদের ভাষণে বলেন, আজ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলায় মহিলাদের সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সভায় প্রধান বক্তা, সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আজকের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নারীর নিরাপত্তা রক্ষার দাবিতে এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স, অনলাইন লটারি ও সুপ্রিম কোর্টের অগণতান্ত্রিক রায়ের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মহিলাদের সংগঠিতভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভানেত্রী কমরেড অনীতা মুখার্জী সমাপ্তি ভাষণে বলেন, সমাজে অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীশক্তি কখনও পিছিয়ে থাকেনি। আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিকামী নারী সমাজের কাছে ৮ মার্চ নিছক আনুষ্ঠানিক দিন নয়, এই দিন সংগ্রামের শপথ নেবার দিন, সংগঠিত হয়ে আন্দোলনকে রূপ দেবার অঙ্গীকারের দিন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অলকা গাঙ্গুলী, সুপর্ণা রায় ও সাবিত্রী ভট্টাচার্য।

মেদিনীপুর

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের কর্মসূচি হিসাবে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মহিলারা গণঅবস্থান করেন। তাঁরা দাবি জানান— সমকাজে মহিলাদের সমমজুরি দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে ও ঘরে-বাইরে মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, অশ্লীল নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপন, মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। স্কুল শিক্ষায় জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত রদ করা, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, নারীপাচার বন্ধ করার দাবি সহ মহিলা পুলিশ ছাড়া মহিলাদের গ্রেপ্তারের সুপ্রিমকোর্টের অগণতান্ত্রিক রায়ের প্রতিবাদ করা হয় এই অবস্থান মঞ্চ থেকে। সমবেত মহিলাদের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লেখা রায়, জেলার সংগঠক কমরেডস্ কল্পনা মজুমদার, অর্চনা রায়, ঝর্ণা জানা, অসীমা পাহাড়ী এবং জেলা সভানেত্রী কমরেড সুনীতা গুপ্তা। উপস্থিত প্রতিবাদী মহিলাদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দপ্তরে এই দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেন।

তমলুক, কাঁথি, এগরা, বেলদা সহ বিভিন্ন স্থানে ৮ মার্চ পথসভা ও অন্যান্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এম এস এস-এর পক্ষ থেকে দিনটি পালন করা হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর

১৪ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে এক পথসভার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সমাজে মহিলাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড বাবলী বসাক ও কমরেড নন্দা সাহা। বক্তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মহিলা সহ সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রদেশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জবলপুরের কাঁচঘর মোড়ে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জবলপুর শাখার উদ্যোগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সভানেত্রী চন্দ্রা পাত্র। সভা পরিচালনা করেন সুভদ্রা বিশ্বাস। জেলা সম্পাদিকা গোপা ভট্টাচার্য সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সামাজিক কুপ্রথা এবং মহিলাদের ওপর ঘটে চলা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীজাতিকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। সভার প্রধান অতিথি সাধনা উপাধ্যায় তাঁর ভাষণে নারী সমাজকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দেন।

নাগপুরে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপন

জনসভায় মূল্যবৃদ্ধি-বেকারত্ব এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির অবনমন ও নারীর মর্যাদাহানির বিরুদ্ধে দু'টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। উপস্থিত সমস্ত মানুষ করতালি দিয়ে প্রস্তাব দু'টির প্রতি সমর্থন জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে গত এক মাস ধরে যে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা চালানো হচ্ছিল, ঐদিন তার ফলাফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার জন্য সংগঠনের উপদেষ্টা ইউ পি বিশ্বাস মহিলাদের অভিনন্দন জানান। জনসভায় জবলপুর শহরের বিপুল সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ভোপালে অবস্থিত রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর ভোপাল শাখার সম্পাদিকা কমরেড জলি সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই-এর মধ্যপ্রদেশ অর্গানাইজিং কমিটির সম্পাদক কমরেড উমাপ্রসাদ। ঐদিন রায়সেনের ভগবানপুরা গ্রামেও নারীদিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ড

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নানা শহরে মহিলাদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। নারীজীবনের উপর বিশ্বায়নের কুপ্রভাব, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, অশ্লীল পত্রপত্রিকা ও সিনেমা প্রদর্শন, পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে এবং সমানাধিকার ও সমমর্যাদার দাবিতে রাঁচি শহরের বিরসা চকের সভায় বক্তব্য রাখেন সরস্বতী দেবী, শিখা বিশ্বাস, শোভা সুমন, সুষমা সিংহ, রেণুকা ত্রিবেদী, ইনু ব্যানার্জী, মালা মণ্ডল, কান্তি কিন্ডো, প্রেমলতা কিস্পোট্টা, ডঃ সূচিতা রানী সহ অন্যান্য বক্তারা।

মহারাষ্ট্র

অখিল ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং খসতারি মহিলা কামগার সংগঠনের উদ্যোগে ১০ মার্চ নাগপুরের রাষ্ট্রভাষা ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও সাবিত্রীবাই ফুলে স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড বীণাপাণি দাস।

এস ইউ সি আই নাগপুর কমিটির সচিব মাধব ভোণ্ডে নারী আন্দোলনে গ্রাম ও শহরের খেটে খাওয়া নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকটি তুলে ধরেন। এছাড়াও অফিস কাছারির খসখসে জল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত নারীশ্রমিক, বর্তমানে যাঁরা কাজ হারাচ্ছেন, তাঁদের নিজস্ব সংগঠন খসতারি কামগার সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া ৮ মার্চ মুম্বই এবং ৯ মার্চ ভিয়ণ্ডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড শ্যামলী মুখার্জী।

ছত্তিশগড়

গত ৯ মার্চ দুর্গের আদিত্য নগরে এম এস এস-এর উদ্যোগে নারীদিবস উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন ঝর্ণা রায় এবং এম এস এস ইনচার্জ কমরেড সন্ধ্যা রায়। এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট নেতা কমরেড বাদশা খান তাঁর ভাষণে সর্বপ্রকার শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানান। অন্নপূর্ণা আগরওয়াল, বিন্দা সারখেল কবিতা পাঠ করেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপতী দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন মাইলস্টোন স্কুলের অধ্যক্ষা মমতা শুক্লা।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৫৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যায় ''রাশিয়ায় বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ বাড়ছে'' শীর্ষক নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে '১৯১১' সালের জায়গায় '১৯৯১' সাল হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।
— সম্পাদক, গণদাবী

ছাত্র কনসেশনের দাবিতে মেদিনীপুরে বাস অবরোধ

মেদিনীপুর জেলার সমস্ত রুটে ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় যাতায়াত, ছুটির দিনেও ছাত্রদের কনসেশন দেওয়া, ন্যূনতম ভাড়া ১ টাকা রাখা ও বেহাল রাস্তা ভালভাবে সারানোর দাবিতে এআইডিএসও মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলন চলছে। উপরোক্ত দাবিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পূর্বমেদিনীপুর জেলাশাসকের নিকট এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের আরটিও'র নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কথা দিয়েছিলেন ছাত্র সংগঠন ডিএসও'র প্রতিনিধি, বাসমালিক ও প্রশাসনকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। কিন্তু তিনি কোন সদর্থক ভূমিকা না নেওয়ায় ১৪ মার্চ সারা জেলায় (পূর্ব-পশ্চিম) বিক্ষোভ ও ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত প্রতীকী পথ অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচি অনুযায়ী তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়নার বরিষা, বাজকুল, কাঁথি, এগরা, মেদিনীপুর শহরের কেরানীটোলা, সবং সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পথঅবরোধ হয়। সর্বত্রই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এবং জনসাধারণ এই অবরোধে সামিল হয়েছিলেন। কাঁথি, এগরা মহকুমায়, কোলাঘাট জগাড় রুটে কনসেশন নিয়ে বহু সময় ছাত্রছাত্রীদের অহেতুক হয়রানি করা হয়। এই হয়রানি বন্ধ সহ ডিএসও'র দাবিগুলি পূরণ না হলে স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার পর জেলা জুড়ে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন হবে বলে ডিএসও জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইরাকে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে

একের পাতার পর

১৯ মার্চ লণ্ডনের ট্রাফলগার স্কোয়ারে ৪৫ হাজার যুদ্ধবিরোধী মানুষ মিছিল করে মার্কিন বর্বরতার প্রতিবাদ জানান।

২০ মার্চ এরাজ্যের সমস্ত বামপন্থী দলের উদ্যোগে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে সিঁথি থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বিকাল ৫টা থেকে ৫-১০ পর্যন্ত ১০ মিনিটের মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশে মানববন্ধন সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল আমাদের দলের উপর। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মানববন্ধনে অংশ নেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী।

১৯ মার্চ সানফ্রানসিসকোতে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

সরকারের নিষ্ঠুর উদাসীনতা

তিনের পাতার পর

মণ্ডল, হুশেন মণ্ডল, নছিমুদ্দিন মণ্ডল সকলেই ছিল সচ্ছল চাষী। ৫০-৬০ বিঘা জমির মালিক। বর্তমানে সকলেই মুনিষ খাটে। কাজ করতে না পারলে ভিক্ষে করে। এই পরিস্থিতিকে ভূমিসংস্কার ও গ্রামোন্নয়নের ধ্বজাধারী এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা স্বীকার করতে চান না। স্থানীয় সিপিএমের বিধায়ক ইউনুস সরকার বলেছেন, 'অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটানোর মতো খারাপ অবস্থা এখনও তৈরি হয়নি।' জেলাশাসকের বিবৃতিও প্রায় একইরকম।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দারিদ্র্য, অনাহার ও মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? বহু বছর ধরে নদীর ভাঙনে ধূলিয়ান থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত এ জেলার বহু এলাকা ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন হয়েছে। হাজার হাজার মেয়ে একটু আহার ও আশ্রয়ের জন্য দেহব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। এ জেলায় ব্যাপকহারে নারীপাচার বাড়ছে। তৎসত্ত্বেও সরকারের টনক নড়েনি। গত দু'বছর ধরে জলঙ্গীর পদ্মা-পাড়ের অসহায় মানুষগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কথা মিছিল ও ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যার পরিণতিতে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা বারবার ঘটে যাচ্ছে। সরকারের একটু জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই দুর্গত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। এখনও পর্যন্ত ভাঙনকে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করা হল না। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ভাঙনরোধে তেমন কিছুই আশার আলো দেখা গেল না। কারণ অনেক বছর আগে সরকার নিযুক্ত কমিশনের প্রস্তাব ছিল, এই প্রকল্পের জন্য অন্তত ৯০০ কোটি টাকা দরকার। অন্ত্যোদয়, জহর রোজগার যোজনা, বার্ধক্যভাতা ইত্যাদি গালভরা স্লোগান অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের এতটুকু আশার আলো দেখাতে পারেনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আশ্রয়হীনদের জায়গা দেয়নি, কিন্তু সরকারি জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে ও তাদের সন্তুষ্ট করতে নেতা-মন্ত্রীদের বিরামহীন প্রচেষ্টা চলছে। জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকার পাহাড় সরকারের হাতে। তার সামান্য অংশ ব্যয় করলে দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। অথচ অনাহারক্লিষ্ট, দুর্গত মানুষদের বাঁচাতে সরকারের টাকা নেই। এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী যারা মানুষের সেবার কথা বলে, তাদের জন্য টাকার অভাব নেই। এদেশে ৫৩৯ জন সাংসদ-এর পিছনে প্রতিদিন খরচ হয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের গুদামে খাদ্য মজুত ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন। গুদামজাত খাদ্য পশুখাদ্য হিসাবে সস্তায় বিদেশে চালান হয়, সমুদ্রে ফেলার কথা হয়। অথচ মানুষ অনাহারে মরে। মানুষের প্রতি একটু ভালবাসা ও দায়বদ্ধতা থাকলে আমলাশোল, দয়ারামপুর ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মতো দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। এই নরহত্যার জন্য খুনী নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তি দরকার। ভাঙনদুর্গত মানুষদের বাঁচার অধিকার আদায়ের জন্য আজ লড়াই করতে হচ্ছে। এই জেলারই খড়িবোনায় ভাঙনদুর্গত মানুষ লড়াই করে দাবি আদায় করেছে। জলঙ্গী, দয়ারামপুরের ভাঙন দুর্গত মানুষ তাদের বাঁচার দাবি আদায় করতে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গত ১৪ মার্চ জলঙ্গী ব্লকের সহস্রাধিক ভাঙন দুর্গত মা-বোন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী অনাহারক্লিষ্ট মানুষ তাদের বাঁচার দাবিতে, কাজ, খাদ্য ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান ও বিডিও অফিস ঘেরাও করে। অবস্থান চলে বেলা ১১টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত। জেলা প্রশাসন ও সিপিএমের নেতৃবৃন্দ এলাকায় অনাহার ও অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বীকার করায় দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে হতদরিদ্র সবহারানো ক্ষুধার্ত মানুষেরা। কাজ না পাওয়া, অনাহারে থাকা, এলাকায় অনাহারে মৃত্যু ও তাদের আশ্রয়হীন জীবনের দুর্দশার কথা মাইকে বলতে বলতে তাঁদের অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রায় চল্লিশ জন দুর্গত মানুষ তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা বলেন। প্রবীণ নিমাই মণ্ডল, নজিমুদ্দিন মণ্ডল ৫০ বিঘা জমির মালিক ছিলেন। এখন মুনিষ খাটেন, মাঝে মাঝে ভিক্ষে করেন। বলতে বলতে তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনাহারে মৃত গহর মণ্ডলের মা আজেবা বিবি বলেন, অনাহারে একটু খাবার ও ওষুধের অভাবে ছেলের মৃত্যু হয়। বলতে বলতে শোকগ্রস্ত মায়ের কথা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন শ্যামলী হালদার, আসমা বেওয়া, আরমান মণ্ডল, মেজানুর সেখ প্রমুখ।

এরপর বিশাল মিছিল করে বিডিও অফিস ঘেরাও করা হয়। পুলিশ বাধা দিলে সহস্রাধিক মানুষ বিডিও অফিসের সামনে বসে পড়েন। জয়েন্ট বিডিও গৌতম দত্ত প্রায় দেড়ঘণ্টা আলোচনার পর বলেন — কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বিডিও অফিসে এসেছে। ফলে অভাবী প্রায় সমস্ত পরিবার কাজের বিনিময়ে খাদ্য পাবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প অন্ত্যোদয়, অন্তঃযোজনার স্কীমে দিন তিনেকের মধ্যে প্রতিটি পরিবার ১২ কেজি করে চাল পাবে, দু-একমাসের মধ্যে চরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের ভাঙাবাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাড়ি গড়ার টাকা দেওয়া হবে, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হবে।

সামগ্রিকভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন 'মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'র জেলা সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, জেলা অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু, স্থানীয় নেত্রী আছিয়া বেগম, প্রবীণ শিক্ষক এহিয়া মণ্ডল প্রমুখ। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত গোপেশ শর্মা, আরমান মণ্ডল, পান্না বিবি, হকমান মণ্ডল, সজল মণ্ডল সহ প্রায় ১৪ জন ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। জয়েন্ট বিডিও'র প্রতিশ্রুতি পেয়ে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। আন্দোলনের জয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দাবি আদায় না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে দৃঢ়তার সাথে সকলেই মত প্রকাশ করেন।

১৪ মার্চ জলঙ্গীর বিডিও অফিসের সামনে ভাঙনদুর্গতদের বিক্ষোভ

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার পারবেলিয়া লোকাল কমিটির এস ইউ সি আই কর্মী এবং শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ছন্দা মৈত্র ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে গত ১৩ মার্চ পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড ছন্দা মৈত্র আশির দশকে দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে নানান সমাজসেবামূলক কাজে নিযুক্ত হন এবং তাঁর সুমধুর ব্যবহারের দ্বারা এলাকার প্রতিটি মানুষের মন জয় করে নেন। তিনি দলের প্রতিটি কর্মী ও এলাকার সাধারণ মানুষের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বস্তরের মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং তাঁদের প্রিয় ছন্দাদিকে চোখের জলে বিদায় জানান। মরদেহে মাল্যদান করেন এসটিইএ'র জেলা সভাপতি তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক আন্দোলনের জেলা নেতা শক্তিপদ কর্মকার, স্বপন লাহিড়ী, সোমনাথ পাত্র এবং এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, জেলা সংগঠক কমরেড মদন আচার্য, কমরেড বুলু সিন্‌হা প্রমুখ।

কমরেড ছন্দা মৈত্র লাল সেলাম

সরকারি বামেরা সংস্কারের বিরোধী নয়

মার্কিন কর্তার মুখে সিপিএম-এর প্রশংসা

আর্থিক উদারনীতি তথা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে এদেশে কংগ্রেস ও বিজেপি যে ভূমিকা পালন করছে, সেই একই ভূমিকা পালন করছে সিপিএম। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, দেশ-বিদেশের শিল্পপতি এবং তাদের মুখপাত্রেরা আজ একথা স্পষ্টভাবেই বলছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ইংরেজি দৈনিকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টাইমস অফ ইন্ডিয়া (৬-৩-০৫) লিখেছে, ''বাম সমর্থিত ইউপিএ সরকারের অধীনে ভারতে আর্থিক উদারনীতিবাদ কী চেহারা নিচ্ছে তা বুঝতে এদেশে এসেছিলেন বাণিজ্যিক কূটনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মার্কিন বিশেষজ্ঞ গেজা ফেকেটিকুটি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলকাতায় সামান্যক্ষণ কাটিয়ে তিনি বুঝে গেছেন যে, তাঁর এই ভ্রমণে প্রতিটি পয়সা ব্যয়ই সার্থক হয়েছে। কারণ, (১) আমি কলকাতায় যা দেখেছি তাতে বুঝেছি, দিল্লির সরকারে বামপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ভারতের সংস্কার কর্মসূচি বিপথগামী হওয়ার কোন ভয় নেই। (২) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার বাক-ঝংকারের থেকে বেরিয়ে এসে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে হাঁটছে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আর (৩) দিল্লীতে গিয়ে বামপন্থীরা যা সব বলছে সেসব তো রাজনৈতিক দরকষাকষির অঙ্গ এবং প্রত্যেকেই সেটা বোঝে।'' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সিপিএম নেতৃত্ব মাঝে মাঝে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিরোধী যে হুংকার ছাড়ে তা নিছকই লোকদেখানো এবং রাজনৈতিক দরকষাকষি মাত্র। গণদাবীর পাতায় তথ্য দিয়ে এই সত্যটি বারেবারেই তুলে ধরা হয়েছে। মালিকশ্রেণীর মুখপাত্র মার্কিন বিশেষজ্ঞ সেটাই বলেছেন অত্যন্ত পরিষ্কার করে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, উইপ্রো'র কর্ণধার তথা দেশের ধনীতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আজিম প্রেমজী সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আর কোনও রাজ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো শিল্পবন্ধু মুখ্যমন্ত্রী নেই' (আনন্দবাজার ২০-১১-০৪)। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও 'বামপন্থী' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় আপ্লুত। বামপন্থী নাম দেখে মার্কিন শিল্পপতিরা এই সরকারকে যাতে ভয় না পায় — সেই বিষয়টি বোঝাতে ''মার্কিন শিল্পপতিদের মনমোহন আশ্বাস দিয়েছেন, বামেরা আর্থিক সংস্কার বিরোধী এমন ভাবার কারণ নেই। কেননা ২৭ বছরের বামশাসিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গই বেসরকারি পুঁজি চাইছে। তাঁর কথায়, 'রাজনীতিকরা বিরোধী আসনে থাকার সময় কী বলেন তা দিয়ে তাঁদের বিচার করবেন না। ক্ষমতায় এসে তাঁরা কী করেন তা দিয়ে বিচার করুন'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩-৯-০৪)।

দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পয়লা নম্বর এজেন্ট বিশ্বব্যাঙ্ক। তারাও সিপিএম সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ''সমাজসংস্কার ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের বামদলগুলির দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করল বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট জেমস ওলফেনসন বলেছেন, এ ব্যাপারে বামেরা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩-১১-০৪)। শুধু কি তাই? কেন্দ্রে গৃহীত যে 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি' নিয়ে সিপিএম উচ্ছ্বসিত, তা বাস্তবে গরিব সাধারণ মানুষের কী কল্যাণ করবে — তারও আঁচ পাওয়া যায় ব্যাঙ্ককর্তার কথায়। ''একই সঙ্গে বর্তমান কংগ্রেস জোট সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ ওলফেনসন। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের লক্ষ্যের সঙ্গেও এই কর্মসূচি সঙ্গতিপূর্ণ''(ঐ)। অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর পক্ষে লুণ্ঠন চালানোর পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক মানবিক মুখোশ হিসেবে জনহিতকর যেসব কর্মসূচি ঘোষণা করে, সিপিএম তথা কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকারের 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি' তেমনই একটি মানবিক মুখোশ। দুজনের এত মিল দেখে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তা তাই বেজায় খুশি।

প্রশ্ন হল, একটা বামপন্থী নামের দলকে মালিকশ্রেণী কখন এবং কেন প্রশংসা করে? শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একদিকে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ এবং অন্যদিকে কোটি কোটি গরিব মেহনতি জনগণের স্বার্থ। দু'টি পরস্পরবিরোধী স্বার্থ। একশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে অন্যশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে হবেই। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন মাও-সে-তুং শিবদাস ঘোষ সকলেই আমাদের এই সত্যটি শিখিয়েছেন। ফলে, যাঁরা নিজেদের বামপন্থী ও মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেবেন, তাঁদেরকে বুঝে নিতে হবে — কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী সহ দেশি-বিদেশি মালিক ও তাদের প্রতিনিধিরা একটা 'বামপন্থী' সরকারের এত প্রশংসা করে কেন? তাহলে সেই সরকার কি আদৌ বামপন্থী? নাকি বামপন্থী নামের আড়ালে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত সেবক?

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পাঁচ মাস পরেও অনুদান পাননি বন্যার্তরা

একটা বুর্জোয়া সরকার যেমন করে জনসাধারণের দাবিকে উপেক্ষা করে, রাজ্যে সিপিএম সরকারও ঠিক তেমন করেই বন্যার্ত মানুষের দাবিকে উপেক্ষা করে চলেছে। পাঁচ মাস আগে বন্যায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা ব্লকের হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর, আবাদী ফসলসহ গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আজও তার কোন ক্ষতিপূরণ মেলেনি। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল হলেও নিয়মানুযায়ী পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ক্ষেত্রে দু'হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা পাওয়ার কথা। আজ পর্যন্ত সেইটুকু টাকাও বণ্টিত হয়নি। ফলে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে হচ্ছে এই মানুষগুলিকে। বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি সিপিএম সরকারের এই নিষ্ঠুর অবহেলা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গরিব মানুষদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী !

সরকারের এই চরম অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে এবং ত্রাণের ন্যায্য দাবি আদায় করে নিতে বন্যার্ত মানুষদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এস ইউ সি আই। বন্যাসমস্যার স্থায়ী সমাধান, ২০০৪-এর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ, ইছামতীর সঙ্গে যমুনা-টৈতা নদীসহ খাল-বিল-বাঁওরের সংস্কার এবং এখানকার মিষ্টি জল সংরক্ষণ, আর্সেনিক কবলিত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে ১৮ মার্চ গাইঘাটা বিডিও অফিসে বিক্ষোভে সামিল হন প্রায় হাজারখানেক মানুষ। এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাসের নেতৃত্বে কমরেডস্ রবিন বিশ্বাস, গৌতম দাস ও ননীবালা বিশ্বাস যুগ্ম বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। বিডিও বলেন, ক্ষতিগ্রস্তরা নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পেয়ে যাবেন। এই 'নির্দিষ্ট সময়' মানে কত বছর — প্রশ্ন তোলেন নেতৃবৃন্দ। পরে তাঁরা বিডিও-কে জানান, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে গৃহনির্মাণের টাকা বণ্টিত না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষ যশোহর রোড অবরোধ করতে এবং বিডিও অফিস ঘেরাওয়ে সামিল হতে বাধ্য হবেন।

১৮ মার্চ গাইঘাটা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

শিলিগুড়িতে
ছাত্র আন্দোলনের জয়

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার বাতাসী শাস্ত্রীজী হাইস্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে উন্নয়নের নামে ৫০ টাকা ডোনেশন আদায় ও বছর বছর বই পরিবর্তনের প্রতিবাদে এবং স্কুলে সাইকেল স্ট্যান্ড ও শৌচাগার নির্মাণের দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ডোনেশন প্রত্যাহার ছাড়া বাকি দাবি মেনে নেয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি এই সংগঠন দু'টির নেতৃত্বে কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী পুনরায় স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। এরপরও কর্তৃপক্ষ অনমনীয় থাকায় ১ মার্চ ঐ স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের ডাকে পুলিশ আসে, কয়েকজন শিক্ষকও ছাত্র ধর্মঘট ভাঙতে নামেন। সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট সফল করে। ছাত্র ধর্মঘট সফল হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকজন শিক্ষক ছাত্রদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। ৭ মার্চ ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় এবং বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রবল আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, জোর করে কারও কাছে ডোনেশন নেওয়া হবে না, স্বেচ্ছায় কেউ দিলে তা নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সেশনে এ বিষয়ে অভিভাবকদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের এই জয় এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বিশ্বজিৎ দত্ত, হরেন সিংহ, শান্তিরঞ্জন সরকার, সুব্রত মণ্ডল, নিজাম মহম্মদ প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দ।

জেপিএ'র পার্লামেন্ট অভিযান

"বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণের ফলে যেভাবে কর্মী ও কর্মসংকোচন হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পুলিশ-মিলিটারি ও প্রশাসন দপ্তর ছাড়া সরকারি ক্ষেত্র বলতে কিছু থাকবে না, সরকারি কর্মচারী বলতে এদের ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে" — ১০ মার্চ দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রীটে সরকারি কর্মচারীদের বিশাল সমাবেশে একথা বলেন, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (জেপিএ)-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। ১০-১১ মার্চ

বক্তব্য রাখছেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ, নিচে পার্লামেন্ট স্ট্রীটে জমায়েতের একাংশ

সংগঠনের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে এদিন ছিল পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচি।

দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য থেকে হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সহ অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীদের কাছেও স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। এই স্মারকপত্রে সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ, কোম্পানিকরণ, কর্মী ও কর্মসঙ্কোচন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি হরণের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। স্মারকপত্রে চাকরির নিরাপত্তা বিধান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, কর্মসংস্থানের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং ধর্মঘটের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে সংবিধান সংশোধন করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া কমিউনিটি হেল্‌থ গাইড সহ সমস্ত অনিয়মিত কর্মীদের স্থায়ীকরণ, ঠিকাপ্রথায় নিয়োগ বন্ধ, ফর্মস স্টোর সহ বিভিন্ন সরকারি অফিস তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সরকারি কর্মচারীদের এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার জন্য জেপিএ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীয় সরকার, সমস্ত রাজ্য সরকার ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে একটি জাতীয় সভা ডাকার দাবি জানিয়েছে।

১১ মার্চ কনস্টিটিউশন ক্লাবের স্পিকার হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ৪০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আগামী দিনে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে সাংগঠনিক বিস্তার, ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন এবং আগামী ১-৭ মে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'বার্তা প্রেরণ সপ্তাহ' পালনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২৯ জুলাই প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে অচিন্ত্য সিংহ, দীপক ঢোলাকিয়া, এ কে মজুমদার এবং এস কে পরাশর নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ২৬ জনের সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার শিক্ষাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করছে

— প্রভাস ঘোষ

শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করছে — এই মর্মে বিধানসভায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন — "শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া এবং সরকারি আর্থিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) পরিচালিত সরকারও বিজেপি এবং কংগ্রেসের পথে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দিচ্ছে। এতে শিক্ষার ব্যয়ভার অত্যধিক বাড়বে এবং প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষাকে পুঁজিবাদের প্রয়োজনে কিছু শিক্ষিত টেকনোক্র্যাট তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে।

আমরা এই শিক্ষা সংহারক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

এঙ্গেল ইন্ডিয়া'র বেসরকারীকরণের প্রতিবাদ

ইউ টি ইউ সি - লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ১৭ মার্চ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন,

"বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের নীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে কংগ্রেস, বিজেপি সরকারের মতই জলের দামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা এঙ্গেল ইন্ডিয়াকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার। আমরা দাবি করছি যে এই বেসরকারীকরণ করা চলবে না এবং জলের দামে জনগণের বিপুল সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দেবার চক্রান্তের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্য উদ্‌ঘাটন এবং দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।"

অ্যাবেকার সংগঠকদের ওপর সিপিএম-এর আক্রমণ

অন্যান্য দাবি সহ সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) আহ্বানে ২২শে মার্চ পার্লামেন্ট অভিযানের প্রাক্কালে, ১৬ই মার্চ অ্যাসোসিয়েশনের হাওড়া জেলার বেলুড় অফিসে সিপিএমের ২৫/৩০ জন দুর্বৃত্ত নৃশংস আক্রমণ চালায়। আচমকা অফিসে ঢুকে, কোন কথাবার্তা ছাড়াই তারা উপস্থিত কর্মীদের নির্বিচারে মারধোর শুরু করে। তাদের বেপরোয়া আক্রমণে অ্যাবেকার রাজ্য কার্যকরী কমিটির প্রবীণ সদস্য সমীর ঘোষ এবং বেলুড় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বৃদ্ধ ভীষ্মদেব মাইতি গুরুতর আঘাত পান। ৭৫ বছরের প্রবীণ আহত ভীষ্মদেব মাইতিকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচির প্রচারে অ্যাবেকা যে প্রচার চালাচ্ছে, দেওয়াল লিখন করছে, পোস্টার মারছে, তেমনই একটি পোস্টার নাকি সিপিএমের দখল করা দেওয়ালে মারা হয়েছে — এই অজুহাত তুলেই দুর্বৃত্তরা আক্রমণ চালায়।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে বলেন — সিপিআই(এম) যে জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চায়না, এই আক্রমণ তা প্রমাণ করছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in